http://islamiboi.wordpress.com

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا
وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَاِنْ لَّمْ
تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ
ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۭ وَاللّٰهُ
يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ
وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۭ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣٠﴾
وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ

রুকু ৪

২৭. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে– সে ঘরের লোকদের অনুমতি না নিয়ে ও তার বাশিন্দাদের প্রতি সালাম না করে কখনো প্রবেশ করো না; (নৈতিকতা ও শালীনতার দিক থেকে) এটা তোমাদের জন্যে উত্তম (পন্থা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এসব বলে দিচ্ছেন), যাতে করে তোমরা (কথাগুলো) মনে রাখতে পারো। ২৮. (ঘরের দরজায় গিয়ে) যদি তোমরা কাউকে সেখানে না পাও, তাহলে সেখানে প্রবেশ করো না, যতোক্ষণ না তোমাদের (ঘরে ঢোকার) অনুমতি দেয়া হবে, যদি (কোনো অসুবিধার কথা জানিয়ে) তোমাদের বলা হয় তোমরা ফিরে যাও, তাহলে তোমরা অবশ্যই (বিনা দ্বিধায়) ফিরে যাবে, এটা তোমাদের জন্যে উত্তম; তোমরা (যখন) যা কিছু করো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত থাকেন। ২৯. তবে যেসব ঘরে কেউ বসবাস করে না, যেখানে তোমাদের কোনো মাল সামানা রয়েছে, তেমন কোনো ঘরে প্রবেশে তোমাদের কোনো পাপ নেই; (কেননা) আল্লাহ তায়ালা জানেন যা কিছু তোমরা প্রকাশ করো আবার যা কিছু তোমরা গোপন করো। ৩০. (হে নবী,) তুমি মোমেন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে (নিম্নগামী ও) সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহকে হেফাযত করে; এটাই (হচ্ছে) তাদের জন্যে উত্তম পন্থা; (কেননা) তারা (নিজেদের চোখ ও লজ্জাস্থান দিয়ে) যা করে, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে পূর্ণাংগভাবে অবহিত রয়েছেন। ৩১. (হে নবী, একইভাবে) তুমি মোমেন নারীদেরও বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে, তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে না বেড়ায়, তবে

http://islamiboi.wordpress.com

زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا
يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ
اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ
اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى
الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۭ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ
جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ
وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ۭ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ
فَضْلِهٖ ۭ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا

তার (শরীরের) যে অংশ (এমনিই) খোলা থাকে (তার কথা আলাদা), তারা যেন তাদের বক্ষদেশ মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখে, তারা যেন তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের ছেলে, তাদের স্বামীর (আগের ঘরের) ছেলে, তাদের ভাই, তাদের ভাইর ছেলে, তাদের বোনের ছেলে, তাদের (সচরাচর মেলামেশার) মহিলা, নিজেদের অধিকারভুক্ত সেবিকা দাসী, নিজেদের অধীনস্থ (এমন) পুরুষ যাদের (মহিলাদের কাছ থেকে) কোনো কিছুই কামনা করার নেই, কিংবা এমন শিশু যারা এখনো মহিলাদের গোপন অংগ সম্পর্কে কিছুই জানে না– (এসব মানুষ ছাড়া তারা যেন) অন্য কারো সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, (চলার সময়) যমীনের ওপর তারা যেন এমনভাবে নিজেদের পা না রাখে– যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছিলো তা (পায়ের আওয়াযে) লোকদের কাছে জানাজানি হয়ে যায়; হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, (ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যে) তোমরা সবাই আল্লাহর দরবারে তাওবা করো, আশা করা যায় তোমরা নাজাত পেয়ে যাবে। ৩২. তোমাদের মধ্যে যাদের স্ত্রী নেই, তোমরা তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করো, (একইভাবে) তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা ভালো মানুষ তাদেরও (বিয়ে শাদীর ব্যবস্থা করো); যদি তারা অভাবী হয়, (তাহলে) আল্লাহ তায়ালা (অচিরেই) তাঁর অনুগ্রহ দিয়ে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ, ৩৩. যাদের বিয়ে (করে ব্যয়ভার বহন) করার সামর্থ নেই, আল্লাহ তায়ালা তাদের নিজ অনুগ্রহে

http://islamiboi.wordpress.com

حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ
الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ؕ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا
لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ
اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ
الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٤﴾

অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে; তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস দাসীদের ভেতর যারা (মুক্তির কোনো অগ্রিম লিখিত) চুক্তি লিখিয়ে নিতে চায়, তোমরা তাদের তা লিখে দাও, যদি তোমরা তাদের (এ চুক্তির) মধ্যে কোনো ভালো (সম্ভাবনা) বুঝতে পারো, (তাহলে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন তা থেকে তাদের মুক্তির সময় (মুক্তহস্তে) দান করবে; তোমাদের অধীনস্থ দাসীদের যারা সতী সাধ্বী থাকতে চায়, নিছক পার্থিব ধন সম্পদের আশায় কখনো তাদের ব্যভিচারের জন্যে বাধ্য করো না; যদি তোমাদের কেউ তাদের (এ ব্যাপারে) বাধ্য করে, (তাহলে তারা যেন আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, কারণ) তাদের এ বাধ্য করার পরেও (তাওবাকারীদের প্রতি) আল্লাহ তায়ালা (হামেশাই) ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ৩৪. (হে মোমেনরা,) আমি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, আরো উদাহরণ (হিসেবে) পেশ করেছি তোমাদের আগে (দুনিয়া থেকে) চলে গেছে তাদের (ঘটনাগুলো), পরহেযগার লোকদের জন্যে (তা হচ্ছে শিক্ষণীয়) উপদেশ।

তাফসীর

আয়াত ২৭-৩৪

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, ইসলাম তার ঈপ্সিত পরিচ্ছন্ন ও সৎ সমাজ গড়ার ব্যাপারে কেবল শাস্তির ওপরই নির্ভর করে না, বরঞ্চ সব কিছুর আগে সে নির্ভর করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার ওপর। ইসলাম মানুষের স্বভাবগত চাহিদাকে প্রতিহত করে না, তবে এগুলোকে সুশৃংখল ও পরিশীলিত করে এবং এগুলোর জন্যে এমন পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করে যেখানে কোনো কৃত্রিম উত্তেজনা সৃষ্টিকারী উপকরণ থাকবে না।

এ ক্ষেত্রে ইসলামী প্রশিক্ষণ পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, বিপথগামিতার সুযোগ যতো দূর পারা যায় সংকীর্ণ করতে হবে, খারাপ পথে ঠেলে দেয় এমন উপকরণগুলোকে দূর করতে হবে এবং যৌন আবেগকে উস্কে দেয় এমন উপকরণ যাতে সমাজে প্রবেশ করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সাথে স্বাভাবিকভাবে এবং শরীয়ত সম্মত পরিচ্ছন্ন পন্থায় যৌন চাহিদা পূরণের পথের সকল বাধাও দূর করতে হবে।

এ কারণেই ইসলাম মুসলমানদের বাড়ী ঘরকে এতোটা পবিত্র ও সুরক্ষিত করেছে যে, সে কাউকে তার পবিত্রতাকে লংঘন করার অনুমতিই দেয় না। অনুমতি না নিয়ে কোনো আগন্তুকের অতর্কিতে অন্যের গৃহে প্রবেশ করাকেও অনুমতি দেয় না। এভাবে গৃহবাসীর অজান্তে তাদের

http://islamiboi.wordpress.com

গোপনীয় জিনিস ও আবরনীয় অংগে কারো দৃষ্টি পড়ার আশংকা থাকে না। এর পাশাপাশি মুসলিম নারী পুরুষের দৃষ্টি সংযত করা এবং যৌন কামনা বাসনাকে উস্কে দেয়ার মতো সাজ-গোজ করে বেপর্দাভাবে ঘোরাফেরা করা থেকে বিরত থাকার বিধানও বলবৎ রয়েছে।

একই উদ্দেশ্যে দরিদ্র নারী ও পুরুষের বিয়ে সহজ করার বিধানও চালু রয়েছে ইসলামে। কেননা ব্যাভিচার প্রতিরোধের প্রকৃত নিশ্চয়তা নিহিত রয়েছে বিয়ের ব্যবস্থায়। অনুরূপভাবে, দাসীবাঁদীদেরকে দেহ ব্যবসায় নিয়োগ করতেও নিষেধ করা হয়েছে, যাতে করে এই অপরাধ সমাজে সহজ সাধ্য হয়ে যেতে না পারে।

কারো ঘরে প্রবেশের অনুমতি নেয়ার গুরুত্ব

এবার ইসলামের প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলোর ওপর বিস্তারিতভাবে দৃষ্টি দেয়া যাক।

'হে মোমেনরা, তোমরা অন্যদের বাড়ীতে প্রবেশ করো না গৃহবাসীর অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে। ..... (আয়াত ২৭-২৮)

আল্লাহ তায়ালা গৃহকে আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন। মানুষ বাইরের কাজ কর্ম সেরে বিশ্রামের জন্যে নিজের বাড়ীতে ফিরে আসে। তখন তাদের মন তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত হয় এবং নিজেদের গোপনীয়তা ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা সম্পর্কে আশ্বস্ত হয়। বাইরে সতর্কতা ও সচেতনতার যে চাপ তার স্নায়ুকে ভারাক্রান্ত করে রাখে। বাড়ী এসে তা ঝেড়ে ফেলে সে হাপ ছেড়ে বাঁচে। বাড়ী যদি এতোটা নিরাপদ ও সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল না হতো যে, বাড়ীর অধিবাসীদের অনুমতি ছাড়াই যে কেউ সেখানে ঢুকে পড়তে পারে, তাহলে তা এরূপ তৃপ্তিকর জায়গায় পরিণত হতো না।

বিনা অনুমতিতে অপরের বাড়ীতে প্রবেশের ফল দাঁড়ায় এই যে, আকস্মিকভাবে কোনো গোপনীয় ও অবাঞ্ছিত দৃশ্য চোখে পড়ে যেতে পারে, কোনো আপত্তিকর ও কামোত্তেজনা সৃষ্টিকারী ব্যাপারও দৃষ্টিগোচর হয়ে যেতে পারে এবং অনিচ্ছাকৃত আকস্মিক দৃষ্টিপাত একাধিকবার হয়ে তা ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাতে রূপান্তরিত হয়ে বিপথগামীতার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। অতপর ক্রমশ তা পাপাচারমূলক ও অবৈধ সম্পর্কেরও জন্ম দিতে পারে।

জাহেলী যুগে এরূপ রীতি প্রচলিত ছিলো যে, একজন আরব অতর্কিতে অন্যের বাড়ীতে ঢুকে পড়তো এবং বলতো, 'ঢুকে পড়েছি!' এভাবে কখনো কখনো গৃহকর্তাকে স্বীয় স্ত্রীর সাথে এমন অবস্থায় দেখতে পেতো যা অন্য কারো দেখা উচিত নয়, অথবা নারী বা পুরুষকে নগ্ন কিংবা দেহের গোপনীয় অংশ অনাবৃত অবস্থায় দেখতে পেতো। এটা গৃহকর্তার জন্যে বিব্রতকর ও কষ্টদায়ক হতো এবং গৃহের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বিঘ্নিত হতো। তা ছাড়া উত্তেজনাকর দৃশ্য বহিরাগতদের চোখে পড়ার কারণে জায়গায় জায়গায় গোলযোগ ও উচ্ছৃংখলতার ঘটনাও ঘটতো।

এ সব কারণেই আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে এই উঁচুমানের আদব তথা ভদ্র আচরণ শিক্ষা দিয়েছেন যে, অন্যের বাড়ীতে প্রবেশের আগে গৃহবাসীর কাছে থেকে অনুমতি নিতে হবে, তাদেরকে সালাম দিয়ে তাদেরকে আপন করে নিতে হবে এবং তাদের মন থেকে বিরূপ মনোভাব দূর করতে হবে,

'হে ঈমানদাররা! তোমরা অন্যের বাড়ীতে ততোক্ষণ প্রবেশ করো না যতোক্ষণ না সে বাড়ীর অধিবাসীদের অনুমতি গ্রহণ ও তাদেরকে সালাম করো। .....'

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এখানে অনুমতি গ্রহণ বুঝানোর জন্যে 'ইসতেনাস' শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে, যার ধাতুগত অর্থ দাঁড়ায়, 'বন্ধুসুলভ অভ্যর্থনা পাওয়া, ঘনিষ্ঠ হওয়া, আন্তরিকতা সহকারে অভ্যর্থনা পাওয়া, আপন হওয়া বা করা, পোষ মানানো, বিনীত হওয়া, বশীভূত হওয়া,

http://islamiboi.wordpress.com

ইত্যাদি। অর্থাৎ শুধু অনুমতি গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং আন্তরিকভাবে ও বন্ধুসুলভ মনোভাব নিয়ে অভ্যর্থনা জানানো চাই, এ দ্বারা সচ্ছন্দে ও সাদরে অনুমতি দান এবং আগন্তুকের ভদ্রজনোচিতভাবে আগমন ও অনুমতি প্রার্থনাও বুঝায়, যা গৃহবাসীর মনে তার প্রতি স্বতস্ফূর্ত সহৃদয়তা ও অভ্যর্থনার মানসিক প্রস্তুতি জন্মায়। এভাবে যে বিষয়টির দিকে অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা এই যে, আগন্তুক অতিথিকে অন্যের বাড়ীতে প্রবেশের আগে বাড়ীওয়ালার মানসিক অবস্থা, সাংসারিক অবস্থা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সেসব অত্যাবশ্যকীয় বিষয়কে বিচেনায় আনতে হবে, যা দিনে কিংবা রাতে আগত অতিথির সামনে প্রকাশ পাক এটা বাড়ীওয়ালা পছন্দ করে না বা প্রকাশ পেলে কিছুটা বিব্রত বোধ করে।

অনুমতি চাওয়ার পর দু'রকম অবস্থা দেখা দিতে পারে, বাড়ীর অধিবাসীরা কেউ বাড়ীতে নেই অথবা আছে। যদি কেউ না থাকে, তাহলে সাড়াশব্দ না পাওয়া সত্তেও অনুমতি চাওয়ার পরই ঢুকে পড়া জায়েয নয়। কেননা অনুমতি প্রাপ্তি ছাড়া প্রবেশ বৈধ নয়।

'যদি সেসব বাড়ীতে তোমরা কাউকে না পাও, তাহলে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত প্রবেশ করো না।'

আর যদি অধিবাসীদের কেউ বাড়ীতে থেকে থাকে এবং অনুমতি না দেয়, তাহলেও প্রবেশ করা যাবে না। কেননা অনুমতি চাইলেই প্রবেশ বৈধ হয়ে যায় না। অনুমতি না দিলে অপেক্ষা করা ও ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকার পরিবর্তে ফিরে যাওয়া কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও,' তাহলে তোমরা ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম।'

অর্থাৎ কোনো রকম অপমান বোধ বা কুণ্ঠাবোধ না করে এবং বাড়ীওয়ালা খারাপ ব্যবহার করলো বা ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করলো ইত্যাদি না ভেবে সরাসরি ফিরে যাওয়া উচিত। কেননা মানুষের অনেক অজানা সমস্যা, অসুবিধা বা ওযর আপত্তি থাকতেই পারে। মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক সমস্যা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাদেরকে বিব্রত না করে একাকী থাকতে দেয়া উচিত।

'আর তোমরা যা কিছুই করো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে অবগত।'

অর্থাৎ মানুষের মনের যাবতীয় গোপন অবস্থা এবং যাবতীয় আবেগ ও উত্তেজনা সম্পর্কে তিনি অবহিত।

পক্ষান্তরে যে সমস্ত ঘর বাড়ীতে সব সময় লোকজন বসবাস করে না, যেমন হোটেল, মটেল ও অতিথিশালা ইত্যাদি, সেগুলোতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ দূষণীয় নয়। কেননা অতিথিদের কষ্ট লাঘবের জন্যে প্রবেশ অপরিহার্য। আর যে যে কারণে অনুমতি গ্রহণ জরুরী, তা এখানে অনুপস্থিত।

'যেসব ঘর বাড়ীতে কেউ বাস করে না, কিন্তু তোমাদের জিনিসপত্র রয়েছে, সেগুলোতে তোমাদের প্রবেশে আপত্তি নেই। আল্লাহ তায়ালা জানেন তোমরা যা কিছু গোপন করো এবং যা কিছু প্রকাশ করো।'

বস্তুত সমগ্র ব্যাপারটা মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য উভয় অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহর অবগত থাকা ও উভয় অবস্থা তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকার ওপরই নির্ভরশীল। এই নিয়ন্ত্রণ ও অবগতিই হৃদয়ের আনুগত্য ও উল্লেখিত উন্নতমানের ভদ্র আচরণ নিশ্চিত করে যার উল্লেখ আল্লাহ তায়ালা স্বীয় গ্রন্থে করেছেন। এই গ্রন্থই মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যে বিধান দিয়ে থাকে।

http://islamiboi.wordpress.com

বস্তুত কোরআন একটা পূর্ণাংগ জীবন বিধান। সমাজ জীবনের এই ক্ষুদ্র বিধানটা এতে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সন্নিবেশিত হয়েছে। কেননা মানব জীবনের জন্যে মৌলিক ও খুঁটিনাটি উভয় প্রকারের জরুরী নিয়ম বিধি বর্ণনা করা তার আওতাভুক্ত। কেননা সে তার মৌলিক চিন্তাধারা ও খুঁটিনাটি বিধির মাঝে সমন্বয় বিধান করতে চায়। অন্যের বাড়ীতে প্রবেশের আগে অনুমতি গ্রহণের কড়াকড়ি ও বাধ্যবাধকতা সে সব গৃহের নিরাপত্তা ও পবিত্রতা নিশ্চিত করে। আর এই নিরাপত্তা ও পবিত্রতা নিশ্চিত হওয়ার ফলেই মানুষের বাড়ী ঘর বসবাসের যোগ্য হয়েছে, এর অধিবাসীরা আকস্মিক জনসমাগমজনিত সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে এবং তাদের আভ্যন্তরীণ ও গোপনীয় বিষয়গুলো নিয়ে যখন তখন বিব্রত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। মানুষের আভ্যন্তরীণ ও গোপনীয় বিষয় শুধু যে শরীরের সাথে সংশ্লিষ্ট তা নয়, বরং পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্য দ্রব্য ও আসবাবপত্রের সাথেও এর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। যে কোনো বাড়ীর অধিবাসীদের জন্যে এটা অবাঞ্ছিত, অরুচিকর ও বিব্রতকর বোধ হওয়া বিচিত্র নয় যে, কোনো অতিথি আকস্মিকভাবে বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করে তাদের দ্রব্য সামগ্রীকে অগোছালো অপরিপাটি ও অপরিষ্কার অবস্থায় দেখে ফেলুক। তা ছাড়া গৃহবাসীর মানসিক অবস্থা ও ভাবাবেগেরও গোপনীয়তা থাকতে পারে। যেমন আমাদের অনেকেই এমন স্পর্শকাতর রুচির অধিকারী থাকতে পারে যে, সে বাড়ীর ভেতরে কোনো ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে কান্নাকাটি করছে, কিংবা কোনো উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনায় কারো ওপর ক্রোধান্বিত হয়ে আছে অথবা কোনো কারণে বেদনায় কাতর হয়ে ছটফট করছে, অথচ এসব দৃশ্য বা এর কারণ সে কোনো বহিরাগতকে দেখতে বা জানতে দিতে ইচ্ছুক নয়।

এসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে কোরআন এই উচ্চাংগের আচরণবিধি তথা অনুমতি ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশে কড়াকড়ি সম্বলিত বিধি রচনা করেছে। সেই সাথে আকস্মিক দৃষ্টি বিনিময়ের ও দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ যাতে কম হয়, সেদিকেও দৃষ্টি দিয়েছে। কেননা এগুলো অনেক সময় মানুষের মনের সুপ্ত কামনা-বাসনাকে জাগিয়ে তোলে, এ থেকে অনেক অবাঞ্ছিত সম্পর্ক ও সংযোগের সৃষ্টি হয় এবং শয়তান এ সবের সুযোগ গ্রহণ করে নানা স্থানে নানা রকমের ফেতনা-ফাসাদের জন্ম দিয়ে থাকে।

এ আয়াতগুলো নাযিল হবার সময়ই মুসলমানরা এই সূক্ষ্ম সমস্যাগুলোকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সবার আগে উপলব্ধি করেছিলেন স্বয়ং রসূল (স.)।

আবু দাউদ ও নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হাদীসে হযরত সা'দ বিন ওবাদার ছেলে কায়েস বর্ণনা করেন যে, একবার রসূল (স.) আমাদের বাড়ীতে এসে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলে দরজায় করাঘাত করলেন। সা'দ অস্ফুট স্বরে জবাব দিলেন এবং অনুমতি দিলেন না। কায়েস বলেন, আমি বললাম, আপনি কি রসূল (স.)-কে বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছেন না? সা'দ বললেন, একটু অপেক্ষা করো। তাঁকে আমাদের ওপর বেশী করে সালাম দেয়ার সুযোগ দাও।' কিছুক্ষণ পর রসূল (স.) পুনরায় বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।' এবারও সা'দ অস্ফুট স্বরে সালামের জবাব দিলেন এবং অভ্যর্থনা না জানিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। রসূল (স.) আবারো বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।' এবারও বাড়ীর ভেতর থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে রসূল (স.) ফিরে চললেন। সা'দ তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এলেন এবং রসূল (স.)-এর পিছু পিছু চললেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমি আপনার প্রতিটি সালাম শুনছিলাম ও চুপিসারে তার জবাব দিচ্ছিলাম, যাতে আপনি আমাদের ওপর আরো বেশী করে

http://islamiboi.wordpress.com

সালাম দিতে থাকেন।' এ কথা শুনে রসূল (স.) সা'দের সাথে তার বাড়ীর দিকে ফিরে চললেন। সা'দ রসূল (স.)-এর গোছলের ব্যবস্থা করলেন। গোছলের পর তাঁকে জাফরান রঞ্জিত একটা পশমী পোশাক-'খুমাইসা' পরতে দিলেন। অতপর রসূল (স.) হাত তুলে দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ, সা'দের পরিবার পরিজনের ওপর তোমার রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করো।'

আবু দাউদে বর্ণিত অপর একটা হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে বিশর বর্ণনা করেন যে, রসূল (স.) কারো বাড়ীতে গেলে দরজার মুখের ওপর গিয়ে দাঁড়াতেন না বরং দরজার ডান কোণে বা বাম কোণে দাঁড়াতেন এবং উচ্চ স্বরে বলতেন, 'আস্ সালামু আলাইকুম, আস সালামু আলাইকুম।' কেননা তৎকালে দরজায় কোনো পর্দা টানানো থাকতো না। তাই দরজার মাঝখানে দাঁড়ালে বাড়ীর ভেতরে দৃষ্টি চলে যেতো।

আবু দাউদে আরো বর্ণিত আছে যে, একবার এক ব্যক্তি এসে রসূল (স.)-এর বাড়ীর দরজার ওপর দাঁড়িয়ে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইতে লাগলো। রসূল (স.) তাকে বললেন, এভাবে দাঁড়াও অথবা এভাবে। (অর্থাৎ দরজার ডান কোণে বা বাম কোণে) কেননা দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যেই অনুমতি প্রার্থনা করা হয়ে থাকে।'

সহীহ রোখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রসূল (স.) বলেছেন, কেউ যদি তোমার বাড়ীতে উঁকি ঝুকি মারে, তাহলে তুমি যদি তাকে পাথর মেরে চোখ ফুটো করে দাও, তাহলেও তোমার কোনো দোষ হবে না।

আবু দাউদে বর্ণিত আছে যে, বনু আমের গোত্রের এক ব্যক্তি এসে রসূল (স.)-এর বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি চাইলো। রসূল (স.) তখন বাড়ীতেই ছিলেন। সে বললো, আমি কি ভেতরে আসতে পারি? রসূল (স.) তখন বাড়ীতেই ছিলেন। সে বললো, আমি কি ভেতরে আসতে পারি? রসূল (স.) স্বীয় ভৃত্যকে বললেন, তুমি আগন্তুকের কাছে যাও এবং তাকে অনুমতি চাওয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দাও। তাকে বলো, তুমি বলো, 'আসসালামু আলাইকুম, আমি কি ভেতরে আসতে পারি?' লোকটি পদ্ধতিটা শিখে নিয়ে বললো, 'আসসালামু আলাইকুম, আমি কি ভেতরে আসতে পারি?' তখন রসূল (স.) তাকে অনুমতি দিলেন এবং সে প্রবেশ করলো।

মোজাহেদ বর্ণনা করেন যে, ইবনে ওমর কোনো একটা প্রয়োজনে ফুসতাতে এক কোরেশী মহিলার কাছে এসেছিলেন। রৌদ তপ্ত পথ দিয়ে হেঁটে আসতে তার বেশ কষ্ট হয়েছিলো। তথাপি তিনি কোনো তাড়াহুড়ো না করে শান্তভাবে বললেন, আসসালামু আলাইকুম, আমি কি ভেতরে আসতে পারি? মহিলা বললো, শান্তির সাথে প্রবেশ করুন। ইবনে ওমর পুনরায় অনুমতি চাইলেন এবং সে মহিলাও আগের জবাবের পুনরাবৃত্তি করলেন। এই সময়ে ইবনে ওমর বাইরেই পায়চারি করতে লাগলেন। তিনি তৃতীয়বার বললেন, বলুন, আমি ভেতরে আসতে পারি? মহিলা বললেন, ভেতরে আসুন। অতপর ইবনে ওমর ভেতরে প্রবেশ করলেন।

আতা ইবনে আবি রাবাহ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমার কিছু এতিম বোন রয়েছে, যারা আমার সাথেই লালিত পালিত হয়েছে এবং আমরা একই বাড়ীতে থাকি। তাদের কাছে যেতেও কি আমার অনুমতি নেয়া প্রয়োজন? তিনি বললেন, হা। আমি আবারও তাকে জিজ্ঞেস করলাম, যাতে আমাকে অনুমতি দেন। কিন্তু তিনি অনুমতি দিলেন না। তিনি বললেন, তুমি কি তাদেরকে উলংগ দেখতে চাও? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করো। আমি আবারও তাঁর মতামত জানতে চাইলাম।

http://islamiboi.wordpress.com

তিনি বললেন, তুমি কি আল্লাহর আদেশ মানতে চাও? আমি বললাম হাঁ। তিনি বললেন, তাহলে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করো।

সহীহ বোখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল (স.) গভীর রাতে নিজ পরিবারের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে বিব্রত করতে নিষেধ করেছেন।

অপর এক হাদীসে আছে যে, রসূল (স.) দিনের বেলায় মদিনায় উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাত ভেতরে প্রবেশ না করে মদিনার উপকণ্ঠে যাত্রা বিরতি করেন এবং নিজের সফরসংগীদেরকে বলেন, তোমরা অপেক্ষা করো, আমরা দিনের শেষ ভাগে শহরে প্রবেশ করবো, যাতে তার অধিবাসীরা নিজেদের সাজগোছ পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন করার সুযোগ পায়।

রসূল (স.) ও সাহাবায়ে কেরামের অনুভূতি যে এতোখানি তীব্র ও সংবেদনশীল হয়েছিলো তার কারণ এই যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে এরূপ উন্নতমানের আচরণ পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন।

অথচ আজ আমরা মুসলমান হওয়া সত্তেও এ ধরনের সূক্ষ্ম বিষয়ে আমাদের অনুভূতি ভোতা হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি তার কোনো আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তির কাছে দিনের বা রাতের যে কোনো প্রহরে ও যে কোনো মুহূর্তে অতর্কিতে অতিথি হতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না, একবার অতিথি হয়ে এলে আর বিদায় হবার নামটিও মুখে আনি না। যতোক্ষণ বাড়ীওয়ালা বিরক্ত হয়ে বিদায় না দেয়, ততোক্ষণ যেতেই চায় না। অনেকের বাসায় টেলিফোন থাকে। কারো বাড়ীতে যাওয়ার আগে টেলিফোনের মাধ্যমে অনুমতি চাওয়ার সুযোগ থাকে। এতে করে তাৎক্ষণিকভাবে অনুমতি পাওয়া যেতে পারে, আবার সময়টা অনুপযোগী এই ওজুহাতে তা বিলম্বিতও হতে পারে। অথচ আমরা এর কোনো তোয়াক্কা না করে সময় অসময় বিবেচনা না করে যখন তখন আমাদের আত্মীয়স্বজনের ঘাড়ে সওয়ার হই। তারপর প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় এমন রীতিও চালু নেই যে, গৃহস্থ এরূপ অতর্কিত অতিথির আগমনে বিরক্ত হলে আগন্তুক ফিরে যাবে।

আমরা এমন মুসলমান যে, ঠিক খাওয়া দাওয়ার সময়েও যে কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে হাযির হয়ে যাই। গৃহস্থ যদি খাবার না দেয় তবে তাতেও অসন্তুষ্ট হই। কখনো বা রাতের বেলা হাযির হয়ে যাই এবং গৃহস্থ যদি রাতে থাকতে না বলে তবে অসন্তুষ্ট হই। তাদের সুবিধা অসুবিধার কোনো তোয়াক্কা করি না।

এর কারণ এই যে, আমরা ইসলামী রীতিনীতির অনুশীলন করতে অভ্যস্ত হইনি। রসূলের শিক্ষাকে আমরা নিজেদের খেয়াল খুশীর উর্ধে স্থান দিতে প্রস্তুত নই। আমরা নিছক একটা ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থার দাসে পরিণত হয়ে গিয়েছি, যার সপক্ষে আল্লাহ তায়ালা কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি।

অথচ অমুসলিমদের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, তারা ইসলামী রীতিনীতির অনেকটা কাছাকাছি রীতিনীতি অনুসরণ করে। তাদের রীতিনীতি আমাদেরকে অনেক সময় মুগ্ধ করে। আর আমরা নিজেদের আসল দ্বীন সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করি না। যদি তা করতাম তাহলে তার দিকে ফিরে গিয়েই আমরা সাচ্ছন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করতাম।

অন্যের বাড়ীতে প্রবেশ করার আগে অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত ইসলামী আচরণ নিয়ে আলোচনা এখানে শেষ করা হয়েছে। এটা শুধু যে একটা সুসভ্য নৈতিক আচরণ তা নয়, বরং ভাবাবেগ ও মনমানসিকতাকে পবিত্র করা ও পবিত্র রাখা এবং এ ক্ষেত্রে বিশৃংখলা ও অরাজকতার উপকরণগুলো থেকে সমাজকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা দানকারী একটা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাও বটে।

http://islamiboi.wordpress.com

চারিত্রিক বিকৃতি রোধে কোরআনের কর্মসূচী

এরপর চলাচলের পথে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সেই আপদটি নিয়ে আলোচনা শুরু করা হচ্ছে, যা দৃষ্টি ও চলাচলের মধ্য দিয়ে বিপথগামিতায় প্ররোচিত করে। আল্লাহ বলেন,

'তুমি মোমেন পুরুষদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে .....। (আয়াত ৩০-৩১)

ইসলাম এমন একটা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেখানে সর্বক্ষণ যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয় না এবং সর্বক্ষণ যৌন ভাবাবেগকে উদ্দীপিত করার কার্যক্রম চালু থাকে না। কেননা অব্যাহত যৌন সুড়সুড়িমূলক তৎপরতা সমাজে এমন কামোন্মাদনা সৃষ্টি করে, যা কখনো প্রশমিত ও পরিতৃপ্ত হয় না। কূদৃষ্টি নিক্ষেপ, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ভংগিতে চলাফেরা, সৌন্দর্য প্রদর্শন করে চলা এবং নগ্নতা এর কোনোটাই পাশবিক কামোন্মত্ততা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোনো সুফল বয়ে আনে না। মানুষের আত্মসংযমের ক্ষমতাকে বিনষ্ট করে দেয়াই হচ্ছে এগুলোর একমাত্র স্বার্থকতা। আত্মসংযমের এই ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়ার পর যদি অবাধ যৌনাচারের সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে সেটা হবে সমাজকে এক উদ্দাম উচ্ছৃংখলতা, বেলেল্লাপনা ও নৈরাজ্যের মধ্যে নিক্ষেপ করার শামিল। আর উত্তেজিত করার পর যদি কঠোর দমন নীতি অবলম্বন করা হয়, তাহলে স্নায়বিক রোগ ও মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়া অবশ্যম্ভাবী। এই শেষোক্ত ব্যাপারটা হবে এক ধরনের নির্যাতনমূলক কার্যক্রম।

যৌন আবেগকে প্ররোচিত ও উত্তেজিত করার এ জাতীয় তৎপরতা প্রতিহত করা, নর নারীর স্বাভাবিক যৌন আবেগকে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বহাল রাখা এবং কোনো কৃত্রিম উপায়ে তাকে উস্কে না দিয়ে তার পবিত্র ও নিরাপদ প্রয়োগ অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করাই ইসলামের পরিচ্ছন্ন সমাজ গড়ার অন্যতম কর্মপন্থা।

এক সময়ে বলা হতো যে নরনারীর অবাধ দৃষ্টি বিনিময়, নিয়ন্ত্রণহীন আলাপ ও ভাবের আদান প্রদান, অবাধ মেলামেশা, পরস্পরের গোপনীয় অংগ প্রত্যংগ সম্পর্কে অবগতি, ও নর নারীর মধ্যে অবাধ যোগাযোগ ইত্যাদি তাদের সম্পর্ককে স্বাভাবিকতা ও স্বাচ্ছন্দ দান করে, তাদের অবরুদ্ধ কামনা বাসনাগুলোকে স্বাধীন ও মুক্ত করে, মানসিক পীড়ন ও মনস্তাত্বিক জটিলতা থেকে রক্ষা করে, যৌন উৎপীড়ন ও চাপজনিত উত্তাপ ও উত্তেজনাকে প্রশমিত করে এবং অন্যান্য অবাঞ্ছিত দৈহিক ও মানসিক চাপ থেকে মুক্ত করে।

নর নারীর সম্পর্ককে অবাধ ও বল্গাহীন করার স্বপক্ষে এই প্রচারণা ফ্রয়েড ও তাঁর সমমনা দার্শনিকদের রচিত বিভিন্ন মতবাদ প্রচারিত হবার ফলেই ব্যাপকতা লাভ করে। সেসব মতবাদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সেই সমস্ত গুণ বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত করা, যা তাকে পশু থেকে পৃথক ও উন্নত এক প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত করে। মানুষকে পুরোপুরি পশুতে রূপান্তরিত করাই ছিলো সেসব মতবাদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু উল্লেখিত প্রচারণা নিছক তাত্ত্বিক আন্দায অনুমান ছাড়া আর কিছু নয়। যেসব দেশে নর নারীর সম্পর্ক সবচেয়ে অবাধ, বল্গাহীন ও স্বেচ্ছাচারিতায় পূর্ণ এবং সব রকমের সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় ও মানবীয় কড়াকড়ি বর্জিত, সেসব দেশে আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি, তা সে প্রচারণাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অসার প্রতিপন্ন করে।

আমি সেসব দেশে প্রত্যক্ষ করেছি যে, নগ্নতা ও অবাধ মেলামেশা যতো রকমের ও যতো আকারের হতে পারে, তার সবই সেখানে বিদ্যমান এবং তাতে বিন্দুমাত্রও কোনো কড়াকড়ি ও বিধিনিষেধ নেই। কিন্তু এর ফলে যৌন আবেগ কিছুমাত্র পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত হয়নি, বরং এর

http://islamiboi.wordpress.com

ফলে যৌনতা আরো বল্গাহীন, উদ্দাম, অবাধ ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। এ উন্মত্ততা ও স্বেচ্ছাচারিতা কোনোক্রমেই শান্ত ও পরিতৃপ্ত তো হয়নি, উপরন্তু তা আরো উগ্র ও আরো তৃষ্ণার্ত রূপ ধারণ করেছে। যে সমস্ত মানসিক রোগ ও জটিলতা নিছক পর্দা প্রথার কারণে নারী সংগ লাভে ব্যর্থ ও বঞ্চিত থাকার কারণে সৃষ্ট হয় বলে মনে করা হতো। সেগুলো প্রচুর পরিমাণে দেখেছি। সেই সাথে সব ধরনের যৌন বিকৃতির হিড়িকও দেখেছি। এ সবই দেখা দিয়েছে সীমাহীন, বল্গাহীন ও অবাধ মেলামেশা ও প্রেম প্রণয়ের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে, যার উপস্থিতিতে কোনো কিছুই আর নিষিদ্ধ থাকে না। প্রকাশ্য রাস্তাঘাটে নগ্ন দেহের প্রদর্শনী, যৌন সুঁড়সুড়ি দানকারী কার্যকলাপ– যার বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার অবকাশ এখানে নেই এবং অনুরূপ অন্যান্য উত্তেজক কর্মকান্ডই এ সব বিড়ম্বনার ফল। এ থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় যে, ফ্রয়েড ও তার সমমনাদের সে সব মতবাদ পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কেননা চাক্ষুস বাস্তবতাই ওগুলোকে মিথ্যা ও ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে।

প্রাণীজগতের জন্ম ও বিকাশে নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সহজাত ও মজ্জাগত। কেননা আল্লাহ তায়ালা এ পদ্ধতিতেই পৃথিবীতে জীবনের বিস্তার ও মানুষের খেলাফত বাস্তবায়িত করেছেন। নর নারীর এই পারস্পরিক টান ও আকর্ষণ একটা স্থায়ী জিনিস। স্বাভাবিকভাবে তা কখনো উত্তেজিত এবং কখনো প্রশমিত হয়ে থাকে। তাকে ক্রমাগতভাবে উত্তেজিত করতে থাকলে তার তেজ ও তীব্রতা বাড়তেই থাকে এবং তাকে দৈহিক মিলনের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভের দিকে ঠেলে দেয়া হয়। কিন্তু সেই মিলন যখন সম্ভব হয় না, তখন উত্তেজিত স্নায়ুমন্ডলী অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এটা একটা সার্বক্ষণিক নির্যাতনে পর্যবসিত হয়।

যৌন উত্তেজনা নানাভাবে সৃষ্টি হয়। কখনো চাহনি দ্বারা, কখনো আচরণ দ্বারা, কখনো হাসি দ্বারা এবং কখনো কৌতুক ও রসিকতা দ্বারা এর সৃষ্টি হয়ে থাকে। কখনো বা আকর্ষণ প্রকাশকারী কথাবার্তা দ্বারাও এর সৃষ্টি হয়। এসব উত্তেজক উপকরণকে কমিয়ে রাখাই নিরাপদ, যাতে পারস্পরিক আকর্ষণ স্বাভাবিক সীমার মধ্যে থাকে এবং স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ করে। এটাই সবচেয়ে বাস্তবসম্মত ও কল্যাণময় পথ। এর সাথে সাথে সে স্বভাব চরিত্রকে পরিশীলিতও করে এবং মানবীয় শক্তিকে শুধু রক্ত মাংসের চাহিদা পূরণের কাজে নিয়োজিত না করে জীবনের অন্যান্য কাজেও নিয়োজিত করে। ফলে শুধু যৌন চাহিদা পূরণই মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় না।

এ আয়াত দুটোতে নর নারী উভয়ের পক্ষ থেকে উত্তেজনা, প্ররোচনা ও বিকৃতির সুযোগ কিভাবে কমাতে হয়, তার কিছু নমুনা পেশ করা হয়েছে। যেমন,

'ঈমানদার পুরুষদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। এটা তাদের জন্যে পবিত্রতম ব্যবস্থা। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত।'

পুরুষদের পক্ষ থেকে দৃষ্টি সংযত রাখা রিপু ও কু-প্রবৃত্তি দমনের একটা উৎকৃষ্ট উপায় এবং নারীর চেহারা ও দেহের সুন্দর ও প্রলুব্ধকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ জানার ইচ্ছা ও দেখার কৌতূহল সংযত করার এক স্বার্থক প্রচেষ্টা। এটা বিপথগামিতা ও অশ্লীলতার পথ বন্ধ করারও অব্যর্থ পন্থা।

লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ দৃষ্টি সংযমেরই স্বাভাবিক ফল। অন্য কথায়, এটা মনোবাসনা নিয়ন্ত্রণ, আত্মসংযম এবং কু-প্রবৃত্তি দমনের পথের প্রাথমিক পদক্ষেপ। এ জন্যে এই দুটোকে একই আয়াতে একত্রিত করা হয়েছে। কারণ এ দুটোর একটা কারণ ও অপরটা ফল। মনোজগতে ও বাস্তবতার জগতে এ দুটো পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ। এভাবে দুটোই পরস্পরের কাছাকাছি।

http://islamiboi.wordpress.com

'এটা তাদের জন্যে পবিত্রতম ব্যবস্থা।'

অর্থাৎ মনের ইচ্ছা ও আবেগকে পবিত্র রাখার সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যবস্থা, অবৈধ ও অপবিত্র স্থানে যৌন চাহিদা চরিতার্থ করা থেকে বিরত থাকার নিশ্চয়তার ব্যবস্থা এবং মানুষের ভাবাবেগকে পশুত্বের পর্যায়ে নেমে যাওয়া থেকে বিরত রাখার প্রকৃষ্ট উপায়। এটা সমাজ জীবনের শালীনতা, পরিচ্ছন্নতা, নারীদের মানসম্ভ্রম ও পরিবেশে সুস্থতা বজায় রাখারও সর্বোত্তম পন্থা।

যেহেতু আল্লাহ মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও স্বভাবগত গঠন এবং তাদের দেহ ও মনের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, তাই তিনিই তাদের চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষার এই ব্যবস্থা করেছেন। 'নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত।'

পর্দার বিধান অপরাধ দমনের সুনিশ্চিত গ্যারান্টি

আল্লাহ তায়ালা পুনরায় বলেন,

'ঈমানদার নারীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত ও লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। .....'

অর্থাৎ পুরুষদের মনের সুপ্ত কদর্য বাসনাকে উস্কে দেয় এমন চোরা চোরা ও বুভুক্ষু চাহনি এবং ইংগিতপূর্ণ ও উত্তেজক দৃষ্টি নিক্ষেপ থেকে যেন বিরত থাকে। আর এমন পবিত্র ও বৈধ পন্থায়ই যেন লজ্জাস্থানকে ব্যবহৃত হতে দেয়, যা পরিচ্ছন্ন ও নিরুদ্বেগ পরিবেশে দেহের স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ করে এবং এভাবে যে সন্তানরা জন্মগ্রহণ করবে, তারা যেন সমাজের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা না পায়।

'আর তাদের সাজ সজ্জাকে যেন প্রকাশ না করে, কেবল আপনা থেকে যা প্রকাশিত হয়ে পড়ে তা ছাড়া।'

বস্তুত নারীর স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত দাবী অনুসারেই সাজ-সজ্জা করা বৈধ। সুন্দরী হওয়া ও সুন্দরী সাজা প্রত্যেক নারীর মজ্জাগত ইচ্ছা। সময়ের ব্যবধানে আকৃতিগতভাবে সাজ গোছের রকম ফের হতে পারে, কিন্তু তার স্বভাবগত ও প্রকৃতিগতভাবে তা মূলত একই রকম। সেটা এই যে, প্রত্যেক নারীই পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করার জন্যে সৌন্দর্যমন্ডিত হতে চায়, আর জন্মগত সৌন্দর্য পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করার জন্যে যথেষ্ট না হলে সাজ সজ্জা দ্বারা সৌন্দর্যকে পূর্ণতা দান করতে চায়।

ইসলাম এই সহজাত ইচ্ছাকে প্রতিহত করে না। সে শুধু একে সুশৃংখল ও পরিশীলিত করে। সে চায় প্রত্যেক নারী তার সাজ সজ্জা ও সৌন্দর্য শুধু একজন পুরুষকে দেখতে দিক, যে তার জীবন সংগী। কেননা এই জীবন সংগী তার জীবনের এমন অনেক কিছুই দেখবার অধিকারী, যা অন্য কেউ দেখবার অধিকারী নয়। তবে তার সৌন্দর্য ও সাজ সজ্জার কিছু অংশ জীবন সংগী ছাড়া মহররম ও এই আয়াতের পরবর্তী অংশে বর্ণিত পুরুষরাও দেখতে পারে। কেননা তাতে এসব পুরুষের মধ্যে কামোত্তেজনার সৃষ্টি হয় না।

পক্ষান্তরে সৌন্দর্যের যে অংশটুকু এমনিতেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তা হচ্ছে হাত ও মুখের সৌন্দর্য। এটুকু উন্মুক্ত করা জায়েয আছে। কারণ রসূল (স.) হযরত আবু বকরের মেয়ে আসমাকে বলেছিলেন, 'হে আসমা, একজন বয়োপ্রাপ্তা মেয়ের হাত ও মুখমন্ডল ছাড়া আর কিছু খোলা বৈধ নয়।'

'আর তারা যেন তাদের চাদর বুকের ওপর জড়িয়ে রাখে।'

http://islamiboi.wordpress.com

'জাইব' শব্দটা দ্বারা এখানে বুকের ওপর কাপড়ের সংযোগস্থলকে বুঝানো হয়েছে। আর 'খেমার' হলো মাথা, গলা ও বুক ঢাকার চাদর বা ওড়না। এই ওড়না বা চাদর দিয়ে বুক ঢাকতে বলার উদ্দেশ্য নারীর দেহের বিপজ্জনক স্থানগুলোকে শিকারী চোখ থেকে এমনকি আকস্মিক দৃষ্টি থেকেও নিরাপদ রাখা। এগুলোকে উন্মুক্ত রাখা হলে এগুলোর ওপর যাদের নযর পড়তো, তাদের জন্যে তা পরবর্তী সময়ে কু-প্ররোচনার উৎস হতে পারতো। মোমেনদের মনকে আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করতে চান না।

যে সকল ঈমানদার নারীর প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছিলো, তাদের অন্তর আল্লাহর জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় ছিলো এবং সৌন্দর্য ও সাজ সজ্জা প্রকাশের স্বাভাবিক আগ্রহ তাদের মধ্যে থাকলেও তাদের ভেতর স্বামীর আনুগত্যে কোনো কমতি ছিলো না। জাহেলী যুগের নারীরা পুরুষদের সামনে বুক ফুলিয়ে চলতো এবং তাতে কোনো আবরণ জড়াতো না। তারা তাদের ঘাড়, চুল কান খোলা রেখেই চলাফেরা করতো। যখন আল্লাহ তায়ালা নারীদেরকে চাদর দিয়ে বুক ঢাকার নির্দেশ দিলেন এবং আপনা থেকে প্রকাশিত হওয়া অংশ ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা অপর পুরুষের সামনে খুলতে নিষেধ করলেন, তখন তারা এই নিষেধাজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। হযরত আয়শা বলেন, প্রাথমিক যুগের মোহাজের মহিলাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা রহমত বর্ষণ করুন। কেননা আল্লাহ তয়ালা যখনই নাযিল করলেন যে, 'তারা যেন তাদের বুকের ওপর চাদর বা ওড়না জড়িয়ে নেয়।' অমনি তারা তাদের ব্যবহারের অন্যান্য কাপড় ছিঁড়ে তা দিয়ে ওড়না বানিয়ে বুক ঘাড় ইত্যাদি ঢাকতে শুরু করলেন। (বোখারী)

হযরত সফিয়া বিনতে শায়বা বর্ণনা করেন যে, আমরা একদিন হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে বসেছিলাম। তিনি কোরায়শ বংশীয় নারীদের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছিলেন। তিনি বললেন, কোরায়েশী নারীদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি আনসারদের স্ত্রীদের চেয়ে আল্লাহর কেতাবের ভক্ত ও বিশ্বাসী আর কাউকে দেখিনি। যখন সূরা নূরের এই অংশ নাযিল হলো, 'তারা যেন চাদর দিয়ে তাদের বুক ঢাকে' তখন তাদের পুরুষরা তাদের কাছে ছুটে এলো, সদ্য নাযিল হওয়া বিধানগুলো তাদেরকে পড়ে শোনালেন এবং প্রত্যেক পুরুষ নিজ নিজ স্ত্রী, মেয়ে, বোন ও প্রত্যেক আত্মীয়কে তা পড়ে শোনাতে লাগলেন। এ আয়াত নাযিল হবার পর কোনো মুসলিম মহিলা বসে থাকেনি। প্রত্যেকে নিজ নিজ কোমরবন্দ খুলে ওড়না বানিয়ে নিয়েছে, যাতে আল্লাহর নাযিল করা বিধান বাস্তবায়িত করা যায়। তারপর রসূল (স.)-এর পেছনে ফজরের সময় যতো মহিলা নামাযে দাঁড়িয়েছে, তাদের সবাই ওড়না পরিহিত ছিলো। (আবু দাউদ)

বস্তুত ইসলাম মুসলিম সমাজের রুচির উন্নতি ঘটিয়েছে এবং তার সৌন্দর্যবোধকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করেছে। সৌন্দর্যবোধের যে অশালীন রূপ রয়েছে, সেটা তার মনোপুত নয়। সুসভ্য মানবীয় সৌন্দর্যবোধই তার পছন্দনীয়। দেহকে অনাবৃত রাখার মাধ্যমে যে সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ ঘটে সেটা অশালীন ও অসভ্যজনোচিত সৌন্দর্যবোধ। এ সৌন্দর্যের প্রতি কোনো মানুষ যখন আকৃষ্ট হয়, তখন সে পাশবিক আবেগ অনুভূতি নিয়েই আকৃষ্ট হয়, চাই তা যতোই সুষ্ঠু ও সর্বাংগীন সুন্দর হোক না কেন। পক্ষান্তরে লজ্জা ও শালীনতার মধ্য দিয়ে যে সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে, সেটাই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্য, সেটাই সৌন্দর্যবোধকে সমুন্নত করে, সেটাই মানুষের উপযোগী এবং সেটাই মানুষের চেতনা অনুভূতি ও মানসিকতাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে।

আজও ইসলাম মুসলিম নারীদের মধ্যে এই পরিবর্তন সূচিত করে থাকে। যদিও সর্বত্র নিম্নমানের রুচিবোধ ও মানসিকতার ছড়াছড়ি, যদিও সমাজের অশালীন ও পাশবিক স্বভাবের

http://islamiboi.wordpress.com

ব্যাপক প্রচলন, যদিও সর্বত্র নগ্নতা, নির্লজ্জতা ও পশুসুলভ বেহায়ামি প্রকট তথাপি মুসলিম নারীরা স্বতস্ফূর্তভাবেই নিজ নিজ দেহের সৌন্দর্যকে ও আকর্ষণীয় অংশকে লুকিয়ে রাখতে সদা সচেষ্ট। যে সমাজের সর্বত্র নগ্নতা, অবাধ মেলামেশা, ঢলাঢলি ও বেলেল্লাপনার হিড়িক চলছে, যে সমাজে পশুদের মত নারীরা পুরুষদেরকে কুরুচিপূর্ণ ইংগিত দিতে অভ্যস্ত, সেই একই সমাজে বাস করে মুসলিম নারীদের এই শালীন ও পবিত্র চাল চলন বিস্ময়কর বৈ' কি?

এই লজ্জা, শালীনতা ও কঠোর পর্দা ব্যক্তি ও সমাজের নিরাপত্তার অন্যতম ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে যেখানে বিপদের আশংকা নেই, সেখানে কোরআন পর্দার কড়াকড়ি শিথিল করে। এ জন্যে সাধারণত যাদের মধ্যে যৌন আকর্ষণ একেবারেই জাগে না, সেসব মহররম পুরুষ থেকে পর্দা না করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যেমন বাপ দাদা, ছেলে, স্বামীদের বাপ দাদা ও ছেলেরা, ভাইরা ও ভাইয়ের ছেলেরা, বোনদের ছেলেরা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে মুসলিম নারীদের বেলায়ও এই বিধি শিথিল। তবে অমুসলিম নারীদের বেলায় নয়। কেননা তারা তাদের স্বামী, ভাই ও তাদের স্বজাতীয় পুরুষদের কাছে নিজেদের দেখা মুসলিম নারীদের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারে। বোখারী ও মুসলিম বর্ণিত এক হাদীসে রসূল (স.) বলেছেন, কোনো নারীর অন্য (বিধর্মী) নারীর সামনে নিজের দেহকে অনাবৃত করা উচিত নয়। তাহলে হয়তো সে নিজ স্বামীর কাছে তার এমন বিবরণ দেবে যে তাকে তার স্বচক্ষে দেখার মতোই মনে হবে। এ ব্যাপারে মুসলিম নারীরা যথেষ্ট বিশ্বস্ত। ইসলাম তাদেরকে নিজ স্বামীর কাছে অন্য কোনো মুসলিম নারীর দেহ ও সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে নিষেধ করে। ইসলাম দাসদের বেলায়ও পর্দার বিধিনিষেধ শিথিল করে। কেউ কেউ বলেন, শুধু দাসীদের বেলায়। আবার কেউ কেউ বলেন, দাসদের বেলায়ও। কেননা কোনো দাস তার মহিলা মনীবের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করে না। তবে প্রথম মতটাই ভালো। অর্থাৎ পর্দার শিথীলতা শুধু দাসীর মধ্যে সীমিত রাখাই উত্তম। কেননা দাস তো রক্ত মাংসেরই মানুষ। সাময়িকভাবে তার অবস্থা যতোই ভিন্নতর হোক না কেন তার মধ্যে যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হতেও পারে। পর্দার বিধান আরো শিথিল করা হয়েছে, সেসব পুরুষের ক্ষেত্রেও, যারা কোনো কারণবশত নারীদের প্রতি যৌন আকর্ষণ পোষণ করে না। যেমন নপুংশক, নির্বোধ, পাগল কিংবা অন্য এমন কোনো প্রতিবন্ধী পুরুষ, যার নারীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিতে কোনো গুরুতর বাধা রয়েছে। কেননা এক্ষেত্রে কোনো বিপদ বা প্রলুব্ধতার আশংকা নেই। অনুরূপভাবে 'যে শিশু নারী দেহের গোপনীয়তা সম্পর্কে অবহিত নয়।' তাকেও এই কড়াকড়ির আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ সেসব শিশু যাদের নারীর দেহ দেহ কোনো যৌন অনুভূতি জাগে না। যখন এই অনুভূতি জাগবে, তখন তাদের যৌবন প্রাপ্তি না ঘটলেও তারা এই কড়াকড়ির আওতায় পড়বে।

একমাত্র স্বামী ছাড়া এসব বিপদমুক্ত পুরুষকে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ব্যতীত শরীরের সকল অংশ দেখতে দেয়া জায়েয এবং তাদেরও শরীরের সকল অংশ দেখা নারীর জন্যে বৈধ। কারণ যে বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করা এই পর্দার উদ্দেশ্য, তা এখানে অনুপস্থিত। অবশ্য স্বামীর জন্যে স্ত্রীর দেহের সকল অংশ দেখা জায়েয।

আর যেহেতু নারীর সতিত্ব ও সম্ভ্রমের সুরক্ষাই এই বিধানের উদ্দেশ্য, তাই আয়াতে নারীর এমন কার্যকলাপও নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা তার গুপ্ত সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে অন্যের সুপ্ত যৌন আবেগকে উস্কে দেয়, যদিও সরাসরি তারা তাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে।

'তারা যেন এমন জোরে জোরে পা না ফেলে, যাতে তাদের লুকানো সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে।'

http://islamiboi.wordpress.com

এ উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, মানুষের মন মানসিকতা, গঠন প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞান কতো গভীর যার ভিত্তিতে তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, অনেক সময় চাক্ষুস দর্শনের চেয়ে কল্পনা যৌন আবেগ উস্কে দেয়ার ব্যাপারে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে থাকে। কেউ কেউ এমনও আছে, যাদের যৌন আবেগ নারীর দেহ দর্শনের চেয়েও তার জুতো, পোশাক বা গহনা দর্শনে অধিকতর উত্তেজিত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে, অনেকে এমনও আছে, যার সামনে নারীর প্রকাশ্য উপস্থিতির চেয়ে তার কল্পনা তাকে অধিকতর উত্তেজিত করে থাকে। এসব উপসর্গ আধুনিক মনোব্যাধি বিশেষজ্ঞদের কাছে সুপরিচিত। এ ছাড়া দূর থেকে গহনার শব্দ শ্রবন ও আতর বা সেন্টের সুবাস গ্রহণ বহু পুরুষের অনুভূতিকে জাগ্রত করে, তাদের স্নায়ুতন্ত্রীকে উত্তেজিত করে এবং তাদেরকে এমনভাবে আলোড়িত ও প্রলুব্ধ করে যে, তা থেকে তারা কিছুতেই নিস্তার পায় না। কোরআন এই সমস্ত জটিল সমস্যার সমাধান দেয়। কেননা যিনি এ কোরআন নাযিল করেছেন তিনিই মানুষ সহ যাবতীয় সৃষ্টির স্রষ্টা এবং তিনি তার সৃষ্টি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত। তিনি সুক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ।

সবার শেষে সকল মোমেনের অন্তরকে আল্লাহর দিকে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে এবং কোরআন নাযিল হবার পূর্বে কৃত সকল গুণাহ থেকে তাওবা করার নির্দেশ দিয়ে তাওবার সুযোগ উন্মুক্ত করা হয়েছে,

'হে ঈমানদাররা! তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।'

এভাবে আল্লাহর তদারকী, তত্ত্বাবধান ও দয়াশীলতা সম্পর্কে সকলকে সচকিত করা হয়েছে, বিপরীত লিংগের প্রতি মানুষের সুগভীর স্বাভাবিক দুর্বলতায় তিনিই যে একমাত্র সাহায্যকারী এবং তাঁর অনুভূতি ও ভীতিই যে তাকে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারে, সে কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

বিয়ের ব্যবস্থা করা একটি সামাজিক দায়িত্ব

এ পর্যন্ত যা কিছু আলোচিত হয়েছে, তা ছিল সমস্যাটার মনস্তাত্ত্বিক ও নিরাপত্তামূলক তথা নেতিবাচক সমাধান। তবে নর নারীর পরপস্পরের প্রতি ঝোঁক ও আকর্ষণ যেহেতু একটা বাস্তব সমস্যা, তাই তার বাস্তব ও ইতিবাচক সমাধানও অপরিহার্য। এই বাস্তব সমাধান হলো বিয়েকে সহজ করে দেয়া। বিয়ের কাজে সহায়তা ও সহযোগিতা করা এবং সেই সাথে যৌন সংগমের অন্য সকল পন্থাকে কঠিন করে দেয়া বা পুরোপুরিভাবে বন্ধ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিতদেরকে..... বিয়ে দাও.....।' (আয়াত ৩২-৩৩)

বস্তুত বিয়ে হচ্ছে নর নারীর পারস্পরিক সহজাত আকর্ষণ ও আবেগ চরিতার্থ করার স্বাভাবিক পন্থা এবং এই আবেগ ও আকর্ষণের পবিত্র লক্ষ্য। তাই এই বিয়ের পথের সকল বাধা অপসারিত করা সকলের কর্তব্য, যাতে মানব জীবন তার স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম গতিতে সচল থাকতে পারে। কিন্তু দাম্পত্য জীবন গড়া ও নর নারীর সতিত্ব ও শ্লীলতা রক্ষার পথের পয়লা বাধাই হলো অর্থনৈতিক বাধা। অথচ ইসলাম একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। সে সতিত্ব ও শ্লীলতা সংরক্ষণকে ফরয করার আগে তার উপায় ও উপকরণ যোগাড় করার ব্যবস্থা করে থাকে এবং সমান অবস্থা সম্পন্ন নরনারীর জন্যে বিয়ে সহজ সাধ্যতা নিশ্চিত করে থাকে। ফলে একমাত্র সেই ব্যক্তিই ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে যে সহজ ও পবিত্র পন্থাকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এবং কোনোরকম বাধ্যবাধকতা ছাড়াই উপেক্ষা করে।

http://islamiboi.wordpress.com

এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা মুসলিম সমাজকে নির্দেশ দেন যে, যারা একমাত্র অর্থের অভাবে হালাল ও বৈধভাবে বিয়ে করতে অক্ষম, তাদেরকে বিয়ে করতে যেন তারা সর্বতোভাবে সাহায্য করে,

'তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিতদের বিয়ে দিয়ে দাও এবং তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা সৎ ও যোগ্য তাদেরও। তারা যদি দরিদ্র হয় তবে আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দেবেন।' .....

এখানে 'আয়ামা' শব্দটা দ্বারা সেসব স্বাধীন নারী ও পুরুষকে বুঝানো হয়েছে যারা স্বামীহীন বা স্ত্রীহীন অবস্থায় রয়েছে। 'আয়ামা'র পরেই দাসদাসীর কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে,

'আর তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা বিয়ের যোগ্য তাদেরকেও।'

এই উভয় শ্রেণীর লোকদেরই অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হলো অর্থাভাব, যা পরবর্তী বাক্য দ্বারা বুঝা যায়,

'তারা যদি দরিদ্র হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে ধনী বানিয়ে দেবেন।'

এখানে মুসলিম সমাজকে আদেশ দেয়া হয়েছে তাদেরকে বিয়ে দিতে। অধিকাংশ ইমাম ও তাফসীরকারের মতে এ আদেশ বাধ্যতামূলক নয়, বরং উপদেশমূলক। তাদের প্রমাণ এই যে, রসুল (স.)-এর যুগে অনেক লোক স্বামীহীন বা স্ত্রীহীন অবস্থায় জীবন কাটিয়ে দিয়েছে। তাদেরকে বিয়ে দেয়া হয়নি। এ আয়াতের আদেশ যদি বাধ্যতামূলক হতো, তবে তাদেরকে অবশ্যই বিয়ে দেয়া হতো।

কিন্তু আমার মত এই যে, এ আদেশ অবশ্যই বাধ্যতামূলক। তবে সেটা এ অর্থে নয় যে, রাষ্ট্র ও সরকার স্বামীহীন ও স্ত্রীহীন নরনারীকে বিয়ে করতে বাধ্য করবে। বরঞ্চ তার অর্থ এই যে, তাদের মধ্যে যারা বিয়ে করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে তাদের সতিত্ব ও শ্লীলতাকে নিরাপদ করা ও সংরক্ষণ করা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যে অবশ্য কর্তব্য বা ওয়াজেব। কেননা বিয়ে হচ্ছে সতিত্বকে কার্যকরভাবে সংরক্ষণ ও সমাজকে ব্যাভিচার ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করা ও পবিত্র রাখার সবচেয়ে বাস্তবসম্মত পন্থা ও উপায়। সমাজকে ব্যাভিচার থেকে পবিত্র রাখা যখন ওয়াজেব, তখন তার পন্থা ও উপায় অবলম্বন করাও ওয়াজেব।

এই সাথে আমাদের এ কথাও বিবেচনায় রাখতে হবে যে, ইসলাম একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার মৌলিক সমাধান দিয়ে থাকে। তাই সে সকল সুস্থ ও সবল মানুষকে নিজের যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজন পূরণের উপযোগী অর্থ ও জীবিকা উপার্জনে সমর্থ বানায় এবং সরকারী কোষাগারের মুখাপেক্ষী হতে দেয় না। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সে সরকারী কোষাগারকেও কিছু কিছু সাহায্য করতে বাধ্য করে। ইসলামী ব্যবস্থায় মূল কথা হলো প্রত্যেক নাগরিক নিজ নিজ উপার্জনে স্বয়ম্ভর হবে এবং কারো মুখাপেক্ষী থাকবে না। সকল নাগরিকের কর্ম সংস্থান ও পর্যাপ্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করাকে সে রাষ্ট্রের কর্তব্য হিসেবে ধার্য করে। বাইতুল মাল বা সরকারী কোষাগার থেকে সাহায্য করাটা ব্যতিক্রমী বা বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য। এর ওপর ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্ভরশীল নয়।

এতদসত্তেও ইসলামী সমাজে যদি কখনো এমন কিছু অবিবাহিত নর নারী বিদ্যমান থাকে, যাদের নিজস্ব সহায় সম্পদ বিয়ে করার জন্যে যথেষ্ট নয়, তাহলে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের

http://islamiboi.wordpress.com

দায়িত্ব। দাসদাসীর ব্যাপারটাও তদ্রূপ। তবে তাদের মনিব বা অভিভাবক যতোক্ষণ তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে সক্ষম থাকবে, ততোক্ষণ এটা তাদেরই দায়িত্ব থাকবে।

নারী হোক বা পুরুষ হোক যারা বিয়ের যোগ্য ও বিয়ে করতে ইচ্ছুক, তাদের বিয়ে শুধু অর্থাভাবে আটকে থাকবে এটা অন্যায় ও অবৈধ। মনে রাখতে হবে, জীবিকা আল্লাহর হাতে। আর আল্লাহ তায়ালাই তাদের অভাব দূর করার নিশ্চয়তা দিয়েছেন যদি তারা নিজেদের সতিত্ব ও শ্লীলতা রক্ষার পবিত্র পথ অবলম্বন করে,

'তারা যদি অভাবী হয় তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাব দূর করে দেবেন।'

রসূল (স.) বলেছেন, তিন ব্যক্তির সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব, আল্লাহর পথে জেহাদকারী, যে পরাধীন ব্যক্তি মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তি লাভে ইচ্ছুক এবং ব্যক্তি বিয়ে করে নিজের সতিত্ব ও শ্লীলতাকে নিরাপদ করতে চায়। (তিরমিযী ও নাসায়ী)

সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বামীহীন নারী ও স্ত্রীহীন পুরুষদেরকে বিয়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তারা যাতে নিজেদের সতিত্ব ও শ্লীলতা রক্ষায় সচেষ্ট থাকে, সে জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে,

'যারা বিয়ে করার সুযোগ পাচ্ছে না তাদের উচিত নিজ নিজ শ্লীলতা রক্ষা করা যতোক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করেন .....'

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা সৎ জীবন যাপনে ইচ্ছুকদের পথ সংকীর্ণ করেন না। কেননা তিনি তাদের ইচ্ছা ও সততা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল।

দাস দাসীদের মানবাধিকার সংরক্ষণ ও পতিতাবৃত্তি দমনে ইসলামের কর্মসূচী

এভাবে ইসলাম এই সমস্যার বাস্তবানুগ সমাধান দেয়। বিয়ের যোগ্য কোনো ব্যক্তি কেবল আর্থিক অক্ষমতার কারণে বিয়ে করতে না পারলে সে তাকে আর্থিক আনুকূল্য দিয়ে বিয়ে করার ক্ষমতা যোগায়। বিয়ে করার পথে সম্ভবত অর্থাভাবই সবচেয়ে বড়ো বাধা। যেহেতু সমাজে দাসদাসীদের অস্তিত্ব সমাজের সামগ্রিক নৈতিক মানের অবনতি ঘটানোর সহায়ক ছিলো এবং এই শ্রেণীটির নিজের মানবিক মর্যাদা সংক্রান্ত চেতনা দুর্বল থাকার কারণে তাদের মধ্যে চারিত্রিক শৈথিল্য দেখা দেয়ার আশংকা ছিলো। অথচ তৎকালে ইসলামের শত্রুরা মুসলিম যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসদাসীতে পরিণত করার দরুণ তাদের যুদ্ধবন্দীদের সাথেও অনুরূপ আচরণ না করে অর্থাৎ তাদেরকেও দাস দাসীতে পরিণত না করে উপায় ছিলো না, তাই ইসলাম সুযোগ পেলেই এসব দাস দাসীকে মুক্তি দেয়ার ব্যবস্থা করে। বিশ্ব পরিস্থিতি যতোক্ষণ দাস প্রথা সর্বতোভাবে বিলোপের অনুকূল না হয়, ততোক্ষণ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম মুক্তিপণ গ্রহণ করে দাস মুক্তির অনুমতি দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে যারা মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তি পেতে আগ্রহী, তাদের মধ্যে যদি কল্যাণ দেখতে পাও, তবে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দাও .....।'

এই মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দেয়ার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে ফকীহদের মতভেদ রয়েছে। আমার মতে এটা অবশ্যই বাধ্যতামূলক। কেননা এ ব্যবস্থা স্বাধীনতা ও মানবীয় মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের মৌলিক বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ। মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তি লাভের চুক্তি সম্পাদিত হবার সময় থেকে শুরু করে দাস বা দাসীর উপার্জিত সকল অর্থ ও পারিশ্রমিক তার নিজের মালিকানাভুক্ত হয়ে যায়,

http://islamiboi.wordpress.com

যাতে সে তা দিয়ে মুক্তি অর্জন করতে পারে। যাকাতেরও একটা অংশ এরূপ ব্যক্তির প্রাপ্য, 'আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে কিছুটা তাদেরকে দাও।' এই ব্যবস্থার জন্যে একমাত্র শর্ত এই যে, মনিব এতে দাস বা দাসীর জন্যে কল্যাণকর মনে করে। আর কল্যাণের পয়লা বিষয় হলো তার ইসলাম গ্রহণ। দ্বিতীয়, তার উপার্জনক্ষম হওয়া চাই। কেননা স্বাধীন হবার পর সে মানুষের ঘাড়ের ওপর বোঝা হয়ে চেপে বসুক-সেটা ইসলাম চায় না। সে উপার্জনের সর্বনিম্ন পন্থারও আশ্রয় নিতে পারে, যা তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করার নিশ্চয়তা দেয়। ইসলাম নাগরিকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দানকারী একটা বাস্তব ব্যবস্থা। তার দৃষ্টিতে 'দাস মুক্তি লাভ করেছে' এই প্রচারণাই বড় কথা নয়। কেননা নিছক লেবেলকে সে গুরুত্ব দেয় না। তার দৃষ্টিতে বাস্তবতাই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো দাস কেবল তখনই মুক্তি পাবে, যখন এই মর্মে নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে যে সে স্বাধীন হবার পর উপার্জনে সক্ষম হবে। সমাজের গলগ্রহ হয়ে রইবে না। কোনো নোংরা পেশা অবলম্বন করে বেঁচে থাকবে না এবং এমন কোনো জিনিস বিক্রি করতে বাধ্য হবে না, যা নাম সর্বস্ব স্বাধীনতার চেয়েও দামী। কেননা সে সমাজকে পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করার জন্যেই তাকে স্বাধীন করেছে, নতুন করে কলুষিত করার জন্যে নয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিছু দাসীর বেশ্যাবৃত্তির পেশায় নিয়োজিত হওয়া খোদ দাস প্রথার চেয়েও মারাত্মক। জাহেলী যুগের মানুষের রীতি ছিলো এ রকম যে, তাদের কারো কোনো দাসী থাকলে তাকে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োগ করতো এবং তার ওপর কর ধার্য করে তা তার কাছ থেকে আদায় করতো। আজও এই পেশা দেশে দেশে প্রচলিত রয়েছে। ইসলাম যখন সামাজিক পরিবেশকে বিশুদ্ধ করতে চাইলো, তখন ব্যাভিচারকে সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো। তবে বল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যাভিচারে নিয়োগ করা সম্পর্কে বিশেষ বিধি জারী করলো এভাবে,

'তোমাদের দাসীদেরকে বলপূর্বক ব্যাভিচারে বাধ্য করো না– যদি তারা সতী থাকতে ইচ্ছুক হয় .....।'

এখানে যারা এই অপকর্মে দাসীদেরকে বাধ্য করতো, তাদেরকে বলপ্রয়োগ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এহেন জঘন্য পন্থায় দুনিয়ার সম্পদ উপার্জন করার জন্যে তাদেরকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করা হয়েছে এবং যাদেরকে বাধ্য করা হতো, তাদেরকে ক্ষমা ও দয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। কেননা এই অপকর্মে তাদের কোনো হাত ছিলো না। তারা নিছক বলপূর্বক ব্যবহৃত হয়েছে।

সুদ্দী বলেন, এ আয়াত মোনাফেক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল সম্পর্কে নাযিল হয়। মুয়াযা নামে তার এক দাসী ছিলো। তার কাছে কোনো অতিথি এলে সে দাসীকে তার মনোরঞ্জনের জন্যে ও অর্থোপার্জনের জন্যে তার কাছে রাত যাপন করতে ও ব্যাভিচার করতে পাঠাতো। দাসীটা হযরত আবু বকরের কাছে গিয়ে ফরিয়াদ জানালে তিনি রসূল (স.)-কে ব্যাপারটা জানান। রসূল (স.) তাকে আটক করার জন্যে আবু বকর (রা.)-কে আদেশ দেন। আবদুল্লাহ এবনে উবাই এ নিয়ে হৈ চৈ করলো। সে এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলো যে, 'মোহাম্মদের অত্যাচার থেকে আমাদেরকে কে বাঁচাবে? সে আমাদের দাসীর ওপরও জোর খাটাচ্ছে।' এই সময় আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন।

সতিত্ব বজায় রাখতে ইচ্ছুক দাসীকে অর্থোপার্জনের নিমিত্তে ব্যাভিচারে বাধ্য করার বিরুদ্ধে এই নিষেধাজ্ঞা সমাজ সংস্কারের কোরআনী কর্মসূচীর অংশ বিশেষ। এ দ্বারা সে যৌন ইচ্ছা

http://islamiboi.wordpress.com

চরিতার্থ করার নোংরা পন্থাগুলো রহিত করেছে। কেননা সমাজে বেশ্যাবৃত্তি চালু থাকলে তা অনেককে সেদিকে প্রলুব্ধ করে। কেননা এটা সহজ পন্থা। এটা যদি প্রচলিত না থাকতো, তাহলে মানুষ পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র পন্থায় এ কাজ সমাধা করতে উদ্বুদ্ধ হতো।

কেউ কেউ বলে যে, বেশ্যাবৃত্তি সমাজের নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং এ দ্বারা ভদ্র পরিবারগুলোর ইযযত সম্ভ্রম রক্ষা পাচ্ছে। কেননা যাদের পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়, তাদের স্বাভাবিক যৌন চাহিদা পূরণের জন্যে এই নোংরা পন্থার বিকল্প নেই। অন্য কথায় তারা বলতে চায়, যৌন ক্ষুধায় উন্মত্ত পশুগুলোর হাত থেকে সতী সাধ্বী নারীদের সম্ভ্রমকে বাঁচাতে হলে এই নোংরা খাদ্যগুলো প্রস্তুত রাখা জরুরী।

আসলে এই চিন্তাধারায় সম্পূর্ণ উল্টো যুক্তি প্রয়োগ করে হয়েছে এবং কারণ ও ফলাফলকে উল্টোভাবে স্থাপন করা হয়েছে। যৌন সংযোগ ও সম্পর্ককে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও নতুন প্রজন্মের দ্বারোদঘাটক হিসাবে বহাল রাখা জরুরী। সমাজ ও রাষ্ট্রকে সচেষ্ট থাকতে হবে তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার সাধন পূর্বক এমন এক পরিবেশ গড়ার জন্যে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি সংগতভাবে জীবন যাপন ও বিয়ে শাদী করতে সমর্থ হবে। এরপরও যদি সেই সমাজে কোনো ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি দেখা দেয় তবে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে তার চিকিৎসা করতে হবে। এতে সমাজে বেশ্যাবৃত্তি বা অন্য এমন কোনো নোংরা প্রথা থাকার প্রয়োজন হয় না, যা যৌন চাহিদা পূরণের দায় দায়িত্ব থেকে অব্যহতি লাভে ইচ্ছুক লোকেরা এ পন্থা অবলম্বন করে থাকে এবং সমাজের জ্ঞাতসারেই এহেন দায়িত্বহীন কাজ তারা করে।

আসলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার এমনভাবে হওয়া প্রয়োজন, যাতে এ ধরনের কদর্য কার্যকলাপের কোনো অবকাশই না থাকে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকৃতির ওজুহাত দেখিয়ে মানবতার এমন অবমাননাকে বৈধ করার কসরত চালানো না হয়।

ইসলাম তার স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা দিয়ে এই মহৎ কাজই সমাধা করেছে। এ দ্বারা সে অধপতিত মানবতার অভাবনীয় উন্নতি সাধন করেছে।

এই পর্বের উপসংহার টানা হয়েছে পবিত্র কোরআনের সেই বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দানের মাধ্যমে, যা তার পটভূমি ও আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ।

'আর আমি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নাযিল করেছি এবং আল্লাহভীরুদের অতীত জাতিগুলোর উদাহরণ এবং সদুপদেশকে এর অন্তর্ভুক্ত করেছি।'

বস্তুত কোরআনের আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন, এতে কোনো জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা নেই, সঠিক ও সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হবারও কোনো কারণ নেই। অতীতে যারা আল্লাহর বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়েছে তাদের বিবরণও এতে রয়েছে। যারা আল্লাহর ভয়ে কম্পমান এবং আল্লাহর ভয়ে সঠিক পথে চলে তাদের জন্যে এতে সদুপদেশ রয়েছে। এ পর্বে আলোচিত বিধিসমূহ এই উপসংহারের সাথে সংগতিশীল, যা কোরআন নাযিলকারী মহান আল্লাহর সম্পর্কে হৃদয়কে সজাগ করে।